রামমোহন রায়

জন্ম ১৭৭২ বা ১৭৭৪, মৃত্যু ১৮৩৩

রামমোহন রায়ের জন্ম হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। কালের হিসাবে তখনও মধ্যযুগ। কিন্তু অন্ধকারময় পরিবেশে দাঁড়িয়ে ভাবীকালের পদধ্বনি তিনিই প্রথম শুনেছিলেন এবং সেইদিকে দেশকে চালনা করেছিলেন। রামমোহন রায়ের জীবন ও কর্মের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক ভূমিকা এটাই।

বাল্যকাল

রামমোহন রায়ের জন্ম হয়েছিল ১৭৭২ এর মে, অথবা ১৭৭৪ এর আগষ্ট মাসে, হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে, এক ভূস্বামী পরিবারে। তাঁর পিতার নাম রামকান্ত রায়, মা তারিনী দেবী। তিনি মধ্যম সন্তান। তৎকালীন অভিজাত পরিবারের ছেলেদের রীতি অনুযায়ী শৈশবেই তিনি আরবি ও ফারসি ভাষা শিখেছিলেন। লেখাপড়ায় তাঁর আগ্রহ ও ক্ষমতা দেখে আশান্বিত হয়ে তাঁর পিতা তাঁকে ঐ দুটি ভাষা ভালো করে শেখবার জন্য পাটনায় পাঠিয়ে দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে এতে করে ছেলে বড় হয়ে নবাব সরকারে ভালো চাকরি পাবে। নবাবি আমল যে শেষ হয়ে গেছে সেকালের অধিকাংশ শিক্ষিতের মত তিনিও তা বুঝতে পানের নি। রামমোহন পাটনায় বছর দুই তিন ছিলেন। ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই অসাধারণ মেধার গুনে তিনি ঐ ভাষা দুটি ভালোভাবে শিখে নিয়ে নানা গ্রন্থ পড়ে ফেললেন। আরবি অনুবাদে অ্যারিস্টটল এবং ইউক্লিডের রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল, এতে তাঁর যুক্তিশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার জন্মাল এবং বুদ্ধি হল পরিমার্জিত। তিনি কোরান পড়লেন, সূফীদের লেখা পড়লেন, হাফিজ ও রুমির রচনার সঙ্গে পরিচিত হলেন। সব মিলিয়ে এই নতুন শিক্ষায় তাঁর মনোজগতে একটা বিপ্লব ঘটে গেল।

লোকপরম্পরায় রামকান্ত শুনতে পেয়েছিলেন তাঁর পুত্র নাকি ইসলামধর্মের অনুরাগী হয়ে উঠছে। তাই তিনি তাড়াতাড়ি তাকে ফিরিয়ে আনলেন এবং হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁকে অনুরাগী করে তোলবার জন্য বিশেষরূপ সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। এবার তাঁকে পাঠানো হল কাশীতে। কাশীতে এসে রামমোহন গভীরভাবে সংস্কৃত শাস্ত্রাদি আরও করলেন। তাঁর এই প্রতীতি জন্মাল যে হিন্দুধর্মের লোকপ্রচলিত চেহারাটা আদি হিন্দুধর্ম নয়। বেদ বেদান্ত উপনিষদে ব্যাখ্যাত সেই প্রাচীন হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মাল এবং লৌকিক আচারমূলক ধর্মাচরনের প্রতি আর কোনও বিশ্বাস রইল না। শুধু হিন্দুধর্ম নয়, তিনি দেখলেন সব ধর্মের সঙ্গেই অনেক অবান্তর সংস্কার জড়িত আছে যা মানবজাতির পক্ষে ক্ষতিকর। তিনি সেই সব সংস্কার বর্জন করে সর্বধর্মের মূল শিক্ষাকে অন্তরে গ্রহণ করলেন।

রাধানগরে তিনি যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর বয়স ষোল বছর পেরিয়েছে মাত্র। তখনই এমন একটা ঘটনা ঘটল যার ফলে তাঁর সারা জীবনের ধারটাই গেল বদলে। গ্রামসমাজের ঘনীভূত কুসংস্কার ও ধর্মের নামে পৌত্তলিকতাকে আক্রমণ করে তিনি একটি পুস্তিকা লিখলেন, নাম দিলেন —হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী। তখনও বাংলা ছাপাখানা হয় নি। বইটি তিনি হাতে লিখেছিলেন মাত্র। কিন্তু তাতেই গ্রামে ও পরিবারে প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হল। বাবা ও মা দুজনেই তাঁকে বিধর্মী বলে ত্যাগ করলেন। গৃহত্যাগ করে রামমোহন পাড়ি দিলেন অজানা ভবিষ্যতের দিকে। সেকালের প্রথা অনুযায়ী ততদিনে তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে। প্রথমা পত্নীর অকালমৃত্যুর পর আরও দুবার। সেই বালিকা দুটি রাধানগরেই রয়ে গেল।

অজ্ঞাতবাস ও আত্মপ্রস্তুতি

এখন থেকে প্রায় চার পাঁচ বছর অবধি তাঁর জীবনের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা জানতে পারি না। তবে তা না হলেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে সেই সময়ের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তা থেকে বোঝা যায় সেই সময় ভারতবর্ষের নানা স্থানে তিনি ঘুরেছিলেন। শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও। বৌদ্ধধর্মের বর্তমান অবস্থা দেখবার জন্য তিনি হিমালয় পেরিয়ে তিব্বতেও চলে গিয়েছিলেন। সেকানে লামাতন্ত্রের নিন্দা করার তাঁর প্রাণসংশয় অবধি হয়েছিল। তিব্বতী রমণীদের সাহায্যে অতি কষ্টে তিনি সেখান থেকে পালাতে পেরেছিলেন। এইভাবে নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে, সেখানকার মানুষজন, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষাদীক্ষা, সমাজ ও ধর্মজীবন সমস্তই তিনি দেখে নিচ্ছিলেন এবং তা থেকে গ্রহণ ও বর্জনের দ্বারা নিজস্ব একটি জীবননীতি তৈরি করছিলেন।

গৃহাগমন ও পুনরায় গৃহত্যাগ

কয়েক বছর পরে রামমোহন বাড়ি ফিরলে প্রথমে সকলেই খুব খুশি হলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বোঝা গেল তিনি তাঁর পুরনো মতামত ত্যাগ করে শান্তশিষ্ট হয়ে ঘরে ফেরেন নি। বরং তা দৃঢ়তর হয়েছে। তখন আবার সংঘাত বাধল। আবার রামমোহন বাড়ি ছাড়লেন। এবারে তাঁর দুই স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে চললেন।

আবার তিনি গিয়ে উঠলেন কাশীতে। তাঁর মত সর্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তির জীবিকার্নির্বাহের অসুবিধা আগেও হয় নি, এখনও হল না। তিনি কাশীতে স্থায়ী সংসার পাতলেন। এখানেই তাঁর পুত্র রাধাপ্রসাদের জন্ম হল। এবার পরিবার প্রতিপালনের পাশাপাশি তিনি মন দিলেন ইংরাজি শিক্ষায়।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হল। পিতার মৃত্যুর পর রামমোহন জানলেন বাবা তাঁকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন নি। কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ি, এবং অন্যান্য সম্পত্তির অংশ তাঁকে দিয়ে গেছেন। কিন্তু মা তা স্বীকার করতে চাইলেন না। তাঁর যুক্তি হল বিধর্মী পুত্রের পিতৃসম্পত্তিতে অধিকার নেই। এই বিতর্কের নিষ্পত্তি সহজে হয় নি, তার চেয়ে ঢের বেশি বৈভব তিনি নিজেই অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল উভয়ত: প্রবল অহংবোধের লড়াই এ, শেষ পর্যন্ত রামমোহন জেতেন।

অর্থোপার্জন

নিজের ভবিষ্যৎ জীবন ও কর্মধারা সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা ততদিনে রামমোহন তৈরি করে নিয়েছেন। তদনুযায়ী তিনি এবার মন দিলেন অর্থোপার্জনে।

ততদিনে রামমোহনের ইংরাজি শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। ডিগবি নামে এক গুহগ্রাহী সিভিলিয়ান সাহেব তখন রংপুরের কালেক্টর। রামমোহন তাঁর অধীনে কাজ নিলেন। প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক অচিরে বন্ধুতায় পর্যবসিত হল। রামমোহন তাঁর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা , চরিত্রগুণ, পরিশ্রম, ও সর্বকর্মে পারদর্শিতার দ্বারা শীঘ্রই কেরানী থেকে দেওয়ানের পদে উন্নীত হলেন। রাজার মত তাঁর ভূসম্পত্তি হল। রামমোহন রাজসিক পুরুষ ছিলেন। অকিঞ্চনের জীবন তাঁর কাম্য ছিল না।

এইবার শুরু হল তাঁর জীবনের আসল কাজ। এতদিন ছিল প্রস্তুতিপর্ব। এখন চাকরি ছেড়ে তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতায় বাস করতে এলেন। সময়টা ১৮১৫। ইংরেজের এই উদীয়মান রাজধানীতে তখন নবযুগের সূচনা হয়েছে। সেই কর্মকান্ডে রামমোহন এবার সারথির ভূমিকা গ্রহণ করবেন। তখন তাঁর পূর্ণ যৌবন। শরীরে অমিত শক্তি, মনে দুর্জয় সাহস, কর্মে প্রবল উৎসাহ, যুগাৎ ধনবল ও বিদ্যাবলে বলীয়ান এক যুগপুরুষ।

ধর্মসংস্কার

কলকাতায় এসে রামমোহন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ও অনুরাগীদের নিয়ে (তাঁরা অধিকাংশই কলকাতা শহরের তৎকালীন প্রধান লোক) আত্মীয়সভা নামক একটি মণ্ডলী স্থাপন করলেন। সেই সভায় ধর্মের সার্বজনীন রূপের কথা স্মরণে রেখে শাস্ত্রাদির চর্চা হত। ধর্মাচরণ তখন আচারসর্বস্ব ও কুসংস্কারময়। হিন্দুরা তাঁদের প্রাচীন আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা ভূলে গেছেন। খৃষ্টান পাদ্রীরা যেন তেন প্রকারে ধর্মান্তর করাতে চাইছেন। আর মুসলমান সমাজ ডুবে আছেন মধ্যযুগের অন্ধকারে। এই পরিস্থিতিতে উদ্গত হল রামমোহনের আত্মীয়সভা। উন্নত চিত্তার ধারক প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলি বঙ্গানুবাদের কাজে লাগলেন রামমোহন নিজেই। বাংলা গদ্যভাষা তখনও গড়ে ওঠে নি। তখনও ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতদের দ্বারা পাঠ্যপুস্তক রচনার পর্ব চলছে। রামমোহনের রচনা এই অর্ধপরিণত বাংলা গদ্যকে বিষয়গৌরব দিল।

এদিকে আত্মীয়সভা ক্রমে বিবর্তিত ও বর্ধিত হয়ে একটি স্বতন্ত্র সমাজ বা গোষ্ঠীর রূপ নিলে তার জন্য তৈরি হল ভবন ও গ্রন্থাগার। সেই ভবনে অসাম্প্রদায়িক

সৃষ্টিসন্ধান

উপাসনার ব্যবস্থা হল। সর্বধর্মের সারাংশ নিয়ে গঠিত হল একটি বিশ্বজনীন ধর্ম (১৮৩০)। একেশ্বরবাদ, অপৌত্তলিকতা, বেদবিহিত আত্মতত্ত্বের ধ্যান এই ধর্মের মূল কথা। এরই নাম ব্রাহ্মধর্ম। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রীদের দ্বারা এই মতাবাদ একটি বৃহৎ ধর্মান্দোলনের চেহারা নিয়েছিল। ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা ও সমাজসংস্কারেও তাদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। কিন্তু সে তো পরের কথা। আপাতত : রামমোহনের এই মতবাদ নিয়ে কলকাতা শহর উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সর্বশক্তি নিয়ে একে আক্রমণ করেছিল রক্ষনশীল হিন্দুদের গোষ্ঠীগুলি। কিন্তু পরিশেষে রামমোহন নিজের পাশে পেয়েছিলেন প্রগতিশীল শিক্ষিত আধুনিক নাগরিকদের। কারণ তাঁর প্রতিবাদ ছিল যুক্তিনির্ভর। বিদ্বিষ্ট গালাগালির প্রতিপক্ষে তিনি তুলে ধরেছিলেন প্রাচীন হিন্দুদর্শনের মহাগ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদ (ক্বচিৎ ইংরাজিও, বিদেশি পাঠকের জন্য) এবং নৈয়ায়িক তর্কবিতর্ক।

সমাজসংস্কার

পরিব্রাজক জীবনে রামমোহন ভারতীয় সমাজজীবনের নানা স্তর ও উপস্তরকে খুব ভালোভাবে দেখেছিলেন। তখন থেকেই তাঁর মনে হয়েছিল যেদিন সুযোগ আসবে সেদিন এর, বিশেষত : নারীদের অবস্থার তিনি পরিবর্তন ঘটাবেন। কলকাতায় আসার পর সেই কাজের সময় হল। প্রথমে তিনি মন দিলেন সতীদাহ নিবারণে। মৃত পতির চিতায় জীবিত স্ত্রীকে দগ্ধ করার এই রীতি বহুদিনের। অতীতে কোনও এক সময় হয়ত তা ছিল বিরল ও স্বেচ্ছাকৃত এক ঘটনা; কিন্তু পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকের বঙ্গদেশে এটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় বলপ্রয়োগের ব্যাপার। এর পেছনে ছিল ধর্মের সমর্থন, সমাজের বাহবা, পরকালের লোভ প্রভৃতি, আর অন্তরালে ছিল বিধবার সম্পত্তি গ্রাস করার লোভ। এই প্রথা উচ্ছেদের জন্য রামমোহনকে দুভাবে যুদ্ধ করতে হয়েছিল - স্বদেশের রক্ষণশীলদের সঙ্গে, এবং বিদেশি রাজশক্তির সঙ্গে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বার হল সহমরণ বিষয়ক প্রথম পুস্তক, তারপর আরও অনেক তর্কবিতর্ক। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে সম্বাদকৌমুদী পত্রিকা বার করে তার মাধ্যমে রামমোহন নিজ মতামত প্রচার করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি সরকারকে চাপ দিতে লাগলেন আইন করে এই প্রথা বন্ধ করবার জন্য। দেশীয় লোকের সংস্কারে হস্তক্ষেপ করে অযথা ঝামেলা টেনে আনতে সরকার রাজি ছিল না। কিন্তু রামমোহন রায় স্বদেশী ও বিদেশি বান্ধবদের সহায়তায় যুক্তিতর্ক ও আন্দোলনের পথে রাজশক্তিকে স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন যে জনগনের মঙ্গলামঙ্গলে তারও কিছু করনীয় আছে। শুধুমাত্র লাভ লোকসানের হিসাবই শেষ কথা নয়। শেষ পর্যন্ত ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সেই আইন বিধিবদ্ধ হল। রক্ষণশীলেরা এর বিরুদ্ধে প্রিভিকৌন্সিল অবধি লড়েছিলেন। তবে তাকে কোনও ফল হয় নি।

শুধু সতীদাহ নিবারণ নয়, অন্ত:পুরে বিধবারা যাতে নিগৃহীতা না হন সে বিষয়েও তাঁর পরিকল্পনা ছিল। তাছাড়া বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কন্যাপণ, কৌলীন্যপ্রথা, হিন্দুনারীর দায়াধিকার, সর্বোপরি স্ত্রীশিক্ষা প্রতিটি বিষয়েই তিনি আন্দোলনের সূচনা করে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সে পথেই হেঁটেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

শিক্ষাবিস্তার

রামমোহন বুঝেছিলেন ব্যক্তিই হোক বা জাতিই হোক, মানুষের যাবতীয় দুর্দশার মূলে আছে অশিক্ষা ও কূপমন্ডুকতা। যে পাশচাত্য জাতি সেদিন পৃথিবী দখল করে সদর্পে দাড়িয়েছিল তাদের উন্নতির মূলে যে সব বিদ্যা আছে রামমোহন ভারতবাসীকে তা এনে দিতে চেয়েছিলেন। এদেশে শিক্ষাক্ষেত্র বলতে তখন ছিল কিছু টোল ও সামান্য মাদ্রাসা। রাজসরকারের গরজ ছিল না দেশীয় প্রজাকে শিক্ষিত করবার। তারা টোল মাদ্রাসার কিঞ্চিৎ সংখ্যা বাড়িয়ে রাজকর্তব্য সমাধা করতে চেয়েছিল। রামমোহন প্রবল প্রতিবাদ করলেন (দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি জানালেন ইংরাজি শিক্ষা চাই। শুধু ইংরাজি ভাষা শিক্ষা নয়, পাশচাত্য দেশের উচ্চশিক্ষায় যে যে বিদ্যার চর্চা আছে সবগুলিই চাই। ইংরাজি ভাষার দরজা দিয়ে পুরো পাশচাত্য সভ্যতার উত্তরাধিকারটি রামমোহন স্বদেশের জন্য আনতে চাইলেন। এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হলেন। আধুনিক শিক্ষানীতি এদেশে বহাল হল। হবার দু বছর পরে রামমোহন প্রতিষ্ঠা করলেন বেদান্ত কলেজ, যেখানে চর্চা হবে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের। এইভাবে প্রাচ্য ও পাশচাত্য উভয় শিক্ষার দরজা তিনি খুলে দিলেন দেশবাসীর জন্য।

সাহিত্যচর্চা

সাহিত্যচর্চা কোনোদিন রামমোহনের লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর হাতেই বাংলা গদ্যের বিকাশ হল। বাংলাগদ্যের যখন নিতান্তই শৈশব, ফোর্ট উইলিয়মের নিযুক্ত পণ্ডিতেরা যখন সবেমাত্র কিছু পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন তখনই কলকাতায় আসেন রামমোহন। বাধ্য হয়ে সেই নবোগত অপরিণত ভাষাতেই তাঁকে লিখতে হয় বেদান্তগ্রন্থ ও বেদান্তসার (১৮১৫), এবং সম্বাদকৌমুদীর (১৮২১) তর্কবিতর্ক। এতে ভাষা বিষয়গৌরব ও পরিশীলন লাভ করে অচিরে সর্বভাব প্রকাশের বাহন হয়ে দাঁড়াল রামমোহনের রচিত গ্রন্থতালিকাটি নিম্নরূপ—

১৮১৫ বেদান্তগ্রন্থ ও বেদান্তসার

১৮১৬ কোনোপনিষৎ, ঈশোপনিষৎ

১৮১৮ গোস্বামীর সহিত বিষয়

সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ (১)

১৮১৯ মুণ্ডকোপানিষৎ

সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক (২)

১৮২০ কবিতাকারের সহিত বিচার

সুব্রহ্মন্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার

১৮২৩ পাদরি শিষ্য সংবাদ

পথ্য প্রদান (পাষণ্ড পীড়নের উত্তর)

১৮২৬ প্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ

কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার

১৮২৮ ব্রহ্মোপাসনা

ব্রহ্মসংগীত

রাজনীতিচেতনা

পলাশীর যুদ্ধের পনেরো বছরের মধ্যে রামমোহনের জন্ম হয়েছিল। কাগজে কলমে তখনও নবাবি আমল। কার্যত : রাজত্ব করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। কোম্পানির পিছনে অলক্ষ্যে অপেক্ষমান ইংরেজ রাজশক্তি। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে কে যে আসল রাজা সেটাই দেশের লোকে বুঝত না। রামমোহন কিন্তু অতি অল্পবয়স থেকেই বুঝে গিয়েছিলেন ইতিহাসের গতিপথ কোন দিকে চলেছে। ইংরেজের সংস্পর্শে এসে, পশ্চিমদেশের উৎকৃষ্ট সংবাদপত্রগুলি নিয়মিত পড়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি

সৃষ্টিসন্ধান

তিনি ধারনা করতে পারতেন। শুধু কলকাতা শহর বা ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে সে সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর যুগে আর কোনও লোকই তা ছিলেন কিনা সন্দেহ। সব কিছু দেখে শুনে বিচার করে তিনি বুঝেছিলেন ইতিহাসের নিজস্ব একটি যুক্তিসঙ্গত গতিধারা আছে। দেশবিশেষের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর তা নিভর করে না। সেই অমোঘ নিয়মে ভারতবর্ষ এখন ইংরেজ অধিকারে যেতে চলেছে। এই অনিবার্য ঘটনা থেকে যতদূর সুফল আদায় করা যেতে পারে এখন ভারতবাসীর সেটাই কর্তব্য। অরাজক, খণ্ডবিচ্ছিন্ন, মাৎস্যন্যায় পরিকীর্ণ ভারতে ইংরাজশাসনের অব্যবহিত যে সুফলগুলি পাওয়া যাবে তা হল (ক) সুশাসন, (খ) অখণ্ড ভারতের প্রতিষ্ঠা (গ) পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার (ঘ) পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগ ও চিত্তের প্রসার (ঙ) বিজ্ঞান চর্চা (চ) গবেষনা ও প্রত্নতাত্বিক উদ্ধারকার্য (ছ) শিল্পবাণিজ্যের দ্বারা আর্থিক পরিবর্তন প্রভৃতি। একথা ঠিক যে ইংরেজ এদেশে বানিজ্য করতে এসেছে বলে তার নিজের লাভটা সে আগে দেখবে। তাই দেশীয় যারা প্রধান পুরুষ তাঁদের ও আত্মস্বার্থরক্ষায় সজাগ থাকতে হবে। নব্য ভারত আত্মসম্মান রক্ষা করে ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে সেখান থেকে যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ করে বলীয়ান হবে। আপাতত : তাই ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক রাখতে হচ্ছে, কিন্তু তা হবে সচেতন ও বানিজ্যিক। নিঃসন্দেহে এ এক উন্নত, গণতান্ত্রিক ও বাস্তববাদী বিচার।

উনবিংশ শতকের বিশের দশক তখন শেষ হতে চলেছে। দেশের জন্য অনেক কাজ রামমোহন করেছেন। এখন তাঁর ইচ্ছা হল পশ্চিমদেশে স্বয়ং গিয়ে দেখে আসবেন বাস্তবিক সে দেশটা কেমন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্যি তারা কী ভাবে? স্বাধীনতার পীঠস্থান ফরাসী দেশে যাবার ইচ্ছাও তাঁর খুবই বেশি ছিল। দিল্লির বাহাদুর শাহের দৌলতে তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হল। এই বাদশা ছিলেন রামমোহনের গুণগ্রাহী। তাঁকে 'রাজা' উপাধি তিনিই দিয়েছিলেন। এখন তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রামমোহনকে নিজের দূত করে পাঠাতে চাইলেন! তাঁর প্রাপ্য সুযোগ সুবিধগুলি যেন তিনি সেখান থেকে আদায় করে নিয়ে আসেন। রামমোহনের নিজের আরও উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সদ্য যে সব আইন প্রণীত হতে চলেছে সেখানে উপস্থিত থেকে সেগুলিকে যথাসম্ভব ভারতবাসীর অনুকূল করা। তার সঙ্গে প্রিভিকৌন্সিলে সহমরণ বিষয়ে আপিলটির শুনানিও ছিল। এই সব নানা উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর আলবিয়ন নামক জাহাজে চড়ে রামমোহন ইংলন্ডের পথে যাত্রা করলেন। যে সব কাজ নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন তার বেশিরভাগই সফল হয়েছিল। বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সেও তিনি গিয়েছিলেন। আর পাশ্চাত্যের সর্বত্র সম্মানে ও সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন ভারতের প্রতিনিধি রূপে।

উপসংহার

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর সামান্য রোগভোগের পর ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যু হল। চিরকাল তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। মৃত্যুর কোনো পূর্বলক্ষণ তাঁর দেহে মনে ছিল না।

ততদিন কলকাতা শহরে নবযুগের সূচনা হয়েছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীরা তাঁর আরব্ধ কর্মের দীপশিখাটিকে জ্বালিয়ে রেখেছেন। বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয় দত্তরা তখনও বালক। আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার রেনেসাঁস তার পূর্নাবিকাশিত রূপ নিয়ে ফুটে উঠবে, জ্ঞানে, কর্মে, স্বাজাত্যবোধে তার যে সর্বাঙ্গীন বিকাশ হবে তার প্রতিটি পথ রামমোহন নির্দেশ করে রেখে গেছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁকে নাম দিয়েছিলেন ভারতপথিক।

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

সৃষ্টিসন্ধান